নতুন সংস্করণ

ডারউইন ডাইলেমা

ডা. শাহরীয়ার শরীফ

কথা সম্ভার

ভূমিকা

দীর্ঘদিন ধরে বিবর্তনবাদ নিয়ে বহু আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনা চলে আসছে। বিবর্তনবাদ খুব সহজেই পশ্চিমাবিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে সমাদৃত হয়ে উঠেছিল এবং খুব তাড়াতাড়ি এটাকে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে প্রায় বিশ্বজুড়েই শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের কোথাও না কোথাও বিবর্তনবাদের কথা থাকে। কিন্তু একটি প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে, তা হলো, বিবর্তনবাদ প্রমাণিত হয়নি। এটি 'অনুমানভিত্তিক' মতবাদ। প্রশ্নোত্তরের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর বিবর্তনবাদ দিতে পারেনি।

পৃথিবীর শুরু থেকে কোন প্রক্রিয়ায় প্রাণিকুল এগিয়েছে? বিবর্তনবাদ নাকি অন্য কোনো প্রক্রিয়া? প্রমাণের অভাবে যদি বিবর্তনবাদ বাতিল হয়ে যায় তবে অন্য কোনো প্রক্রিয়াকেই মেনে নিতে হবে। কষ্টিপাথরে ঘষলে বিবর্তনবাদ অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। সেই সমস্যাগুলোর উল্লেখ করেই এই বই।

—লেখক

সূচি

১. পরিবৃত্তিকালীন জীবাশ্মের অনুপস্থিতি ... ১৩
২. পরিবৃত্তিকালীন জীবন্ত প্রাণীর অনুপস্থিতি ... ১৫
৩. জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল সমস্যা ... ১৭
৪. অর্ধবানরের বিবর্তনবিরোধী অবস্থান ... ১৯
৫. আইডা বিতর্ক ... ২১
৬. ইনডোহায়াস বিতর্ক ... ২৩
৭. ব্যাসিলোসোরিড তিমি বিতর্ক ... ২৫
৮. অ্যামিবা বিতর্ক ... ২৭
৯. মিলার এক্সপেরিমেন্ট ... ৩০
১০. একটি পুরানো হাস্যকর পরীক্ষা ... ৩২
১১. প্ল্যাটিপাস বিতর্ক ... ৩৪
১২. মুখাবয়ব পুনর্গঠনের পূর্বশর্ত ... ৩৬
১৩. আর্ডিপিথেকাস রেমিডাস কাডাব্বা ... ৪১
১৪. আর্কিওপটেরিক্স বিতর্ক ... ৪২
১৫. জীবন্ত জীবাশ্ম ... ৪৪
১৬. ডাইনোসরের ধারা ... ৪৭
১৭. মুরগি বিতর্ক ... ৪৯
১৮. ডাইনোসরের জীবাশ্ম/কঙ্কাল বিষয়ক গবেষণা ৫০
১৯. মানুষ এবং ডাইনোসরের সহাবস্থান বিতর্ক ... ৫২
২০. রেডিও কার্বন ডেটিং বিতর্ক ... ৫৬

২১. সার্ভাইভ্যাল অব দা ফিটেস্ট বিতর্ক ... ৫৭
২২. বুদ্ধিমান প্রাণী ... ৬০
২৩. বাইপোলার বায়োরামা ... ৬৩
২৪. পরিবৃত্তিকালীন জীবের জীবনধারণ সমস্যা ... ৬৪
২৫. নব্য মতবাদসমূহ ... ৬৭
২৬. ভিন্ন প্রজাতির একই গুণাবলি বিতর্ক ... ৬৯
২৭. ডিএনএ বিন্যাস বিতর্ক ... ৭১
২৮. প্রাণের সহসা এবং যৌগিক রূপ নিয়ে আগমনের ইতিহাস ... ৭৩
২৯. গ্যাপ অভ এভলুশন ... ৭৫
৩০. হেকেল-এর আঁকা ভ্রূণ বিন্যাসের ছবি ... ৭৬
৩১. ব্রিটিশ/ইংলিশ পেপার্ড মথ প্রুফ ফিয়াস্কো ... ৭৮
৩২. উপসংহার ... ৮০
৩৩. আলোকচিত্র ... ৮২

পরিবৃত্তিকালীন জীবাশ্মের অনুপস্থিতি

বিবর্তনবাদ অনুযায়ী অতীত পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী বিবর্তন প্রক্রিয়া পার হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে, এর ফলে অতীতের প্রাণীর জীবাশ্ম ঘাঁটলে 'পরিবৃত্তিকালীন জীব'-এর জীবাশ্ম পাওয়া যাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি, অথচ আজ পর্যন্ত একটিও 'পরিবৃত্তিকালীন জীব'-এর জীবাশ্ম (ফসিল) পাওয়া যায়নি। বিবর্তনবাদীদের জন্য এটা খুব বড় আঘাত। তাদের মতবাদ প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে পড়ে এই হিসাবে।

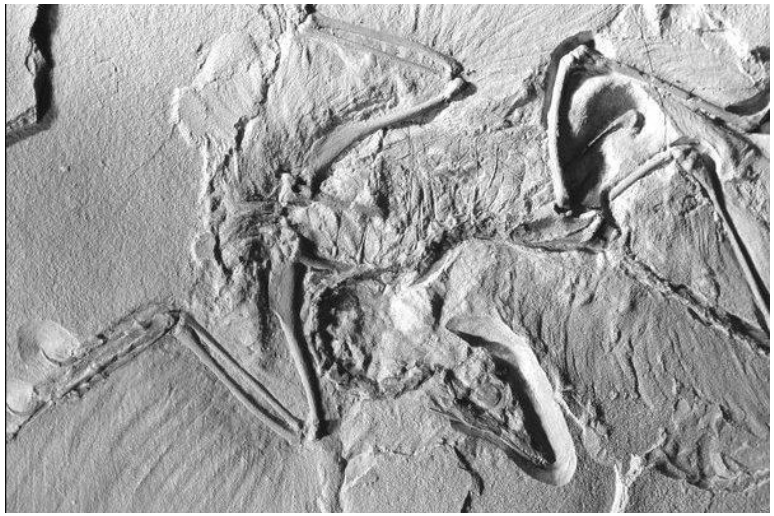

প্রাগৈতিহাসিক যত জীবাশ্ম পাওয়া যায় সেগুলো সবই পুনর্গঠিত অর্থাৎ, সেগুলো 'পরিবৃত্তিকালীন' নয়। কিটপতঙ্গ থেকে শুরু করে হাতি-ঘোড়া পর্যন্ত যা কিছুরই জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা সেই প্রাগৈতিহাসিক কালেও যা ছিল এখনও সেরকমই আছে। এতে কোনো পরিবর্তন পাওয়া যায়নি। জীবাশ্ম তালিকা বা ফসিল রেকর্ডে এই যে বিশাল শূন্যতা অর্থাৎ,

পরিবৃত্তিকালীন জীবাশ্মের অনুপস্থিতি তা বিবর্তনবাদকে ভয়ানক হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। যে কয়টি পরিবৃত্তিকালীন জীবাশ্মের দাবি করা হয় সেগুলোর সাথে যে জালিয়াতি জড়িত সে ব্যাপারে এই গ্রন্থে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

বিবর্তনবাদীরা একটি কথা বলে থাকে যে, কোটি কোটি বছরের দীর্ঘ সময়ের কারণে পরিবৃত্তিকালীন জীব বা জীবাশ্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে বর্তমানে আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে তাদের সামনে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে যে, এত এত ডাইনোসরের জীবাশ্ম পাওয়া গেল কীভাবে? শুধু ডাইনোসরের জীবাশ্ম টিকে রইল আর বাকিদের জীবাশ্ম নেই হয়ে গেল এ কেমন কথা? বৈজ্ঞানিকভাবে এ কথা ধোপে টিকছে না।

পরিবৃত্তিকালীন জীবন্ত প্রাণীর অনুপস্থিতি

'পরিবৃত্তিকালীন জীব' বিবর্তনবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দাবি হিসেবে প্রতিভাত হয়। বলা যায় এটাই বিবর্তনবাদের মূল প্রমাণ। অথচ এই প্রমাণের কোনো অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যবর্তী অবস্থায় যে জীব থাকে তাকে বলা হয় 'পরিবৃত্তিকালীন জীব'। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী পৃথিবীর শুরু থেকেই বিবর্তন চলছে। এটা একটি সদা চলমান প্রক্রিয়া এবং কখনো থামবে না। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীব সবাই এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। সে হিসেবে এই যুগেও আমরা আশেপাশে যেদিকে তাকাই বহু সংখ্যক 'পরিবৃত্তিকালীন জীব' দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু তা পাওয়া যায় না। একটিমাত্র জীবন্ত 'পরিবৃত্তিকালীন জীব'ও পাওয়া যায়নি কোথাও। এমন কোনো মাছ কেউ আজ পর্যন্ত দেখতে পায়নি যার শরীরে অল্প অল্প করে হাত-পা তৈরি হচ্ছে মাটিতে আসার জন্য। এমন একটি স্থলচর প্রাণী নেই যা নদী বা সমুদ্রের তীরে থাকতে থাকতে কিছুটা মাছের বৈশিষ্ট্য পাচ্ছে। এমন কোনো গিরগিটি নেই যেটা আকাশে ওড়ার প্রাথমিক স্তরে এসে কিছু পালক লাভ করেছে। আশেপাশে কোনো 'পরিবৃত্তিকালীন জীব' নেই এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে হাতি বা তিমি মাছ পর্যন্ত।

বিবর্তনবাদের একটি জনপ্রিয় দাবি হচ্ছে ভালুক থেকে তিমি মাছের উৎপত্তি, সেক্ষেত্রে আমরা পুনর্গঠিত ভালুক দেখতে পাই, পুনর্গঠিত তিমি মাছ দেখতে পাই কিন্তু ভালুক ও তিমি মাছের মধ্যবর্তী কোনো 'পরিবৃত্তিকালীন জীব' দেখতে পাই না। অথচ বলা হয় বিবর্তনবাদ একটি সদা-চলমান প্রক্রিয়া। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী মানুষও কোনো পুনর্গঠিত জীব নয়, মানুষও বিবর্তনের মাধ্যমে অন্য কোনো প্রাণীতে বিবর্তিত হবে এবং এমন কোনো নির্দিষ্ট মাত্রা নেই যেখানে এসে বিবর্তন প্রক্রিয়া বন্ধ হবে। অথচ চারপাশের লক্ষ কোটি জীবের মধ্যে একটিও 'পরিবৃত্তিকালীন জীব' নেই। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো মানুষ ও বানরের মধ্যবর্তী

কোনো প্রাণীকে আমরা এখনও পৃথিবীর কোনো বানরের দলের মাঝে দেখি না। সদা চলমান প্রক্রিয়া বলছে কালক্রমে একেবারে প্রাথমিক প্রজাতিগুলো আর থাকবে না। একসময় বিবর্তিত প্রজাতিগুলোই রাজত্ব করবে। সেক্ষেত্রে বানর আর মানুষ স্পষ্টভাবে পাশাপাশি থাকতে পারে না। থাকলে থাকবে মানুষ আর পরিবৃত্তিকালীন অর্ধবানর-অর্ধমানুষ, কিন্তু সেরকম আমরা আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। একটি জীবন্ত অর্ধবানর আজ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি।

এসব প্রশ্নের উত্তর বিবর্তনবাদ আজও দিতে পারেনি। কেউ কেউ দাবি করে বানরের অনেক প্রজাতির মধ্য থেকে মাত্র একটি প্রজাতি মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে তাই বর্তমানে মানুষ ও বানর সহাবস্থান করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো তা সত্ত্বেও অর্ধবানর-অর্ধমানব সেই ধারাটির চিহ্ন থাকতে হবে। তা নেই। তাছাড়া বাকি সব বানর কেন সামান্য পরিবর্তিত হলো না তারও উত্তর নেই। কিছু বানর কেন সোজা হতে গেল? কেন তারা এই কষ্ট করতে গেল লাখ লাখ বছর ধরে? এর কোনো উত্তর নেই!

জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল সমস্যা

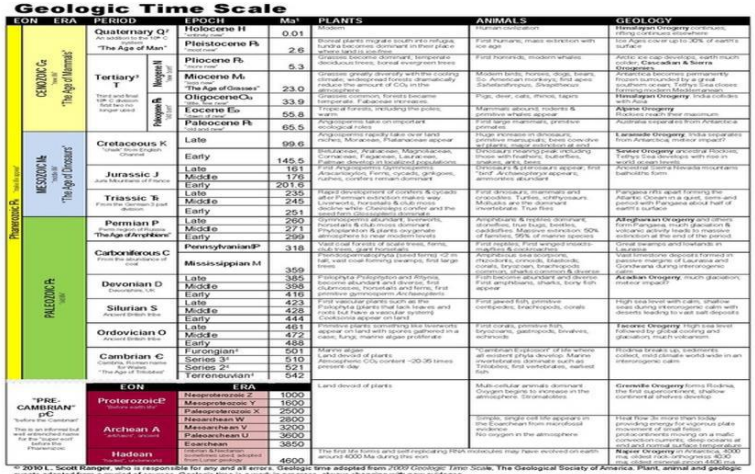

বিবর্তনবাদীরা একটি প্রামাণ্য 'জিওলজিক্যাল টাইম-স্কেল' প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হলেও সেরকম কিছু প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। যে জিওলজিক্যাল টাইম-স্কেল তৈরি করা হয়েছে তাতে অনেক গরমিল আছে এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নয়। এখানে মূল সমস্যাটি হচ্ছে সময় নিয়ে।

বিবর্তনবাদ বলছে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাণীর যে পরিবর্তন হয় তা কোটি কোটি বছর ধরে হয়, ফলে সেসবের সকল জীবাশ্ম বিলীন হয়ে গেছে এবং মানুষের সামনে বিবর্তনের প্রমাণ সহজে ধরা পড়ে না। পরিবৃত্তিকালীন জীব এবং জীবাশ্মের অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই বিশাল সময়ের দাবি এসেছে। সেভাবেই জিওলজিক্যাল টাইম-স্কেল সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই বক্তব্য উত্তর দিতে পারছে না যে, সেক্ষেত্রে ডাইনোসর, ট্রাইলোবাইট এবং আরও বহু প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছে কেন? কেন সেগুলো বিলীন হয়ে যায়নি?

আবার পরিবৃত্তিকালীন জীবাশ্মের অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উলটো এই দাবিও করা হয়েছে যে, বিবর্তন তুলনামূলক তাড়াতাড়ি(মাত্র কয়েক লক্ষ বছরে) হয়ে যায়, ফলে জীবাশ্মের সংখ্যা অনেক কম হয় এবং মানুষের চোখে পড়ে না। এই দুটোর কোনটি সঠিক তা প্রমাণ করতে পারেনি উভয় দাবিদারদের কেউ। যার যার সুবিধা মতো উত্তর বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের ব্যাপারটি হিসেব করলে দেখা যায় প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন খুব দ্রুত (কয়েক সপ্তাহে বা মাসে) হতে পারে এবং এতে প্রজাতি পরিবর্তন হওয়ার মতো কিছু ঘটে না। এগুলো কোনো কোনো প্রাণীর 'ক্যারেক্টারিস্টিকস'-এর মধ্যে পড়ে বলে জীববিজ্ঞানীরা অভিহিত করেছেন। ক্যারেক্টারিস্টিকস(পরিবর্তনীয় এবং অপরিবর্তনীয় উভয় রকমই হতে পারে) আর বিবর্তন এক নয়। যেমন বরফ অঞ্চলে এমন বহু প্রাণী পাওয়া যায় (পাখি, খরগোশ, শিয়াল, হরিণ এবং আরও কিছু প্রাণী) যারা শীতকালীন তুষারপাতের সময় সাদা লোম বা পালক লাভ করে এবং গ্রীষ্মকালের আগমন হলে তাদের লোম বা পালক পুনরায় আগের মতো খয়েরি, ছাইরং ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এরকম প্রতি বছরই ঘটে চলেছে এবং প্রজাতির কোনো পরিবর্তন হয় না। এগুলো এসব প্রাণীর 'ক্যারেক্টারিস্টিকস'-এর ভিতর পড়ছে।

অর্ধবানরের বিবর্তনবিরোধী অবস্থান

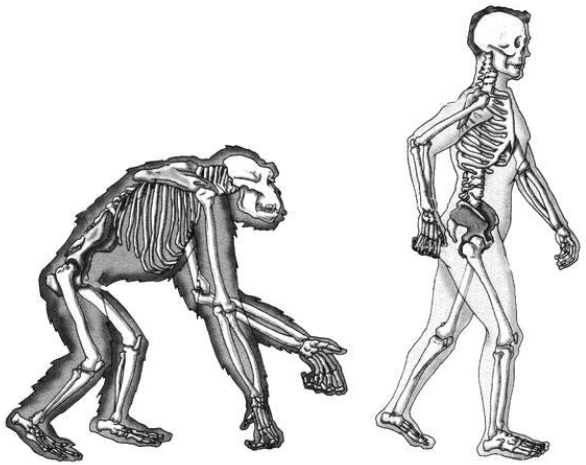

বিবর্তনবাদ অনুযায়ী বানর থেকে মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার ধারণাটি খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ ব্যাপারে একটি ছবি খুব জনপ্রিয়। তাতে আঁকা আছে প্রথমে চার হাত-পায়ে মাটি ছুঁয়ে চলা সাধারণ বানর, সেটার পরবর্তী ধাপগুলোয় কুঁজো হয়ে হাঁটা কয়েকটি অর্ধবানর এবং অবশেষে একদম সোজা হয়ে দাঁড়ানো আধুনিক মানুষ। ছবিটি পাঠ্যপুস্তকে ও অন্যান্য বইয়ে এমনকি টি-শার্টের গায়েও ছাপা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ছবিটিতে একটি বিরাট ভুল রয়ে গেছে যা অনেকেই খেয়াল করেন না। বিবর্তন প্রক্রিয়া হচ্ছে একটি 'প্রো-গ্র্যাভিটি প্রোসেস' অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণমুখী প্রক্রিয়া। কোনো প্রাণী বিবর্তনের মাধ্যমে সুবিধাজনক অবস্থায় যাবে বলে বিবর্তনবাদের দাবি। এক্ষেত্রে মাটি হতে হাত তুলে যখনই কোনো প্রাণী কুঁজো হয়ে হাঁটবে তখনই তাকে মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং ওভাবে চলতে তাকে অযথা প্রচুর শক্তি ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকৃতিতে কিছু প্রাণী কেন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কষ্ট সহ্য করে বাড়তি শক্তি

ব্যয় করে চলবে? এটা প্রকৃতিবিরোধী এবং মাধ্যাকর্ষণবিরোধী পদক্ষেপও বটে। সোজা হয়ে তাদের লাভ কী হবে? বরং সোজা হওয়ার প্রক্রিয়া নিলে দেখা যায় একটি বানর হারাবে তার স্বাচ্ছন্দ্য গতি এবং ক্ষিপ্রতা, যার ফলে এই প্রকৃতিতে তার শিকার ধরার ক্ষমতাও যাবে নষ্ট হয়ে। আমরা দেখতে পাই মানুষের যে গঠন তাতে সে সোজা হয়ে তো হাঁটতে পারে ঠিকই কিন্তু প্রকৃতির মাঝে অন্যান্য প্রাণিকুলের তুলনায় তার গতিবিধি হয়ে পড়ছে একদম সীমিত। দৌড়ে অন্যান্য প্রাণীকে হারানো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এমনকি জোরে ছোটা একটি গরু বা ছাগলকে ধরতে পারাও মানুষের পক্ষে কঠিন। প্রকৃতি কেন এ রকম বেকায়দা অবস্থায় ঠেলে দেবে কিছু প্রাণীকে? বিবর্তনবাদীরা একটি উত্তর দিয়ে থাকে যে, মানুষ সোজা ও বুদ্ধিমান হয়ে ওঠার পর তার ক্ষিপ্রতা সীমিত হয়ে গেল ঠিকই কিন্তু বুদ্ধি খরচ করে সে শিকার ধরতে শিখে ফেলল এবং এক্ষেত্রে সে অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে কম যায় না। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায় যে, মানব-বিবর্তনের লক্ষ লক্ষ বছরের একদম শেষে গিয়ে যদি বুদ্ধিমান মানুষের উদ্ভব হয় তাহলে মধ্যবর্তী কুঁজো হয়ে হাঁটা অর্ধবানরদের সেরকম বুদ্ধি ছিল না, আবার ওদিকে তাদের ক্ষিপ্রতাও গিয়েছিল কমে। ফলে, দৈহিক ক্ষিপ্রতা বা বুদ্ধি কোনোটাই তখন তাদের মধ্যে না থাকায় শিকার ধরার ক্ষেত্রে তাদের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়ার কথা এবং বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। কারণ এই ঘটনা কয়েক মাস বা বছরের নয়, বরং লক্ষ লক্ষ বছরের। এই সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাথরের দেওয়ালের মতো বিবর্তনবাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান প্রশ্নটি হলো একদল বানর কেন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কষ্ট করে লড়াই করে যাবে যেখানে প্রাথমিক অবস্থাই ছিল তাদের জীবনধারণের অনুকূলে?

বিবর্তনবাদীদের আরেকটি দাবি হচ্ছে যেসব বানর গাছ ছেড়ে মাটিতে নেমে এসেছিল তারাই অজ্ঞাত কারণে সোজা হয়ে হাঁটতে শুরু করে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে আমাদের জানামতে সকল বানর শ্রেণির প্রাণীই মাটিতে নামে। লেমুর জাতীয় বানর ছাড়া প্রায় সব বানর শ্রেণিই দিনের একটি সিংহভাগ সময় মাটিতে বিচরণ করে কাটায়। শুধু গাছের উপর দিন কাটানোর মতো শান্ত এই বানর শ্রেণি নয়। বারবার মাটিতে বিচরণ করা সত্ত্বেও তারা কিন্তু বানরই রয়েছে। তাদের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সামান্য চিহ্ন বা সম্ভাবনাও আমরা দেখতে পাই না। তারা গাছেই ফিরে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে না।

আইডা বিতর্ক

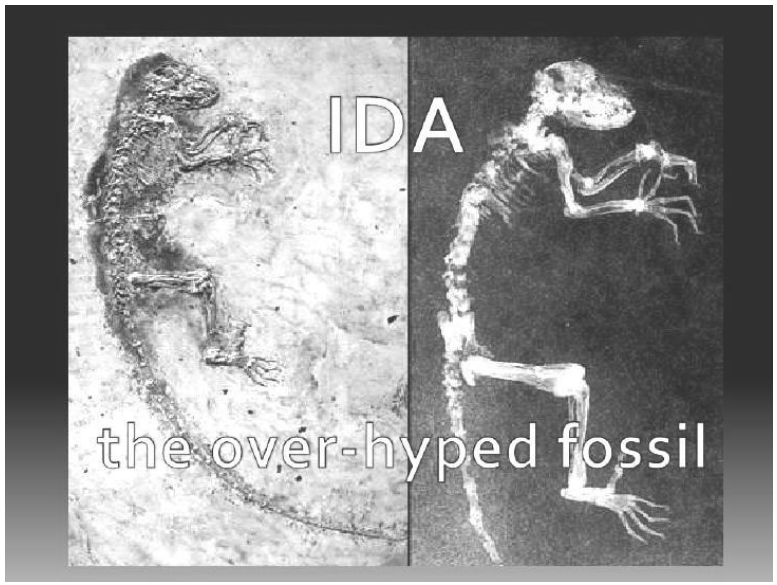

জার্মানিতে ১৯৮৩ সালে আবিষ্কৃত হয় একটি ফসিল। এটি ছিল লেজবিশিষ্ট একটি প্রাগৈতিহাসিক বানর শ্রেণির প্রাণীর জীবাশ্ম বা ফসিল। অবশেষে ২০০৬ সালে এটি আলোচনায় আসে। বয়স নিরূপণ করা হলো চার কোটি সত্তর লক্ষ বছর। ঘোষণা দেওয়া হয় এটাই হচ্ছে 'মিসিং লিংক'। বিবর্তনবাদীদের ভূয়সী প্রশংসাবাক্য এসে জড়ো হতে থাকে এটিকে ঘিরে। সুনাম চলতে থাকে। বলা হতে থাকে এই 'আইডা' (জীবাশ্মটির এই নামকরণ করে এর স্বত্বাধিকারী প্রফেসর জোর্ন হুরাম) হচ্ছে বিবর্তনবাদীদের 'মোনালিসা', বিবর্তনবাদীদের 'রসেটা স্টোন'। নিউইয়র্কের তৎকালীন মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ 'দা লিংক' লেখা টি-শার্ট পরে জীবাশ্মটির পাশে দাঁড়িয়ে প্রচারণা চালালেন। জীবাশ্মটি প্রচারণার

বিরাট সুবিধা লাভ করে। আরও ঘোষণা দেওয়া হয়—এই ফসিলটি 'অষ্টম আশ্চর্য' এবং এটা অবশেষে ডারউইনের বিবর্তনবাদকে প্রমাণ করেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে বিবর্তনবাদীরা বহু আগে থেকেই দাবি করে এসেছে যে বিবর্তনবাদ বহু আগেই নাকি প্রমাণিত হয়ে গেছে।

তাহলে 'আইডা' এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন? যা হোক, নিউইয়র্কের প্যালিয়নটোলজিস্টদের (পুরানৃতত্ত্ববিদ) একটি দল 'আইডা'কে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পায়। নিউইয়র্কের স্টোনি ব্রুক ইউনিভার্সিটির এরিক সেইফের্ট তার দল নিয়ে গবেষণা চালান। অবশেষে তারা ঘোষণা দিলেন এই 'আইডা' একটি প্রাচীন লেমুর বা লরিস জাতীয় বানরের জীবাশ্ম। খ্যাতিসম্পন্ন জার্নাল 'ন্যাচার'- এ তাদের মতামত ছাপা হলো। শুধু তাই নয়, মিশরের উত্তরাঞ্চলে আরেকটি জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় যেটা প্রায় হুবহু 'আইডা'র মতো। এটার বয়স নিরূপণ করা হয় তিন কোটি সত্তর লক্ষ বছর। 'আইডা'র সাথে প্রায় এক কোটি বছরের পার্থক্য অথচ কোনো পরিবর্তনের চিহ্ন নেই, বিবর্তনের চিহ্ন নেই। অবশেষে 'আইডা' কে একটি সাধারণ লেমুর বা লরিস শ্রেণির প্রাচীন বানরের জীবাশ্ম হিসেবেই মেনে নেওয়া হয়েছে। এগুলোর কোনো জীবন্ত বংশধর নেই এবং এগুলো 'ফ্যামিলি-ট্রি'র একটি পার্শ্বডালেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে বহু আগে।

ইনডোহায়াস বিতর্ক

ডারউইনের বলে যাওয়া ভালুক থেকে তিমিতে রূপান্তর হওয়ার ব্যাপারটি বিবর্তনবাদীরা খুব পছন্দ করেছিল এবং বহুদিন প্রচার করে। পরে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কে সমস্যা হওয়ায় তারা তিমি মাছের পূর্বপুরুষ হিসেবে গ্রহণ করে জলহস্তীকে। পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কে জলহস্তীও বাদ পড়ে গেলে বিবর্তনবাদীরা নিয়ে আসে তৃতীয় আরেকটি প্রাণীকে, সেটা হলো ইনডোয়াহাস। ইনডো অর্থ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত এবং হায়াস অর্থ শূকর।

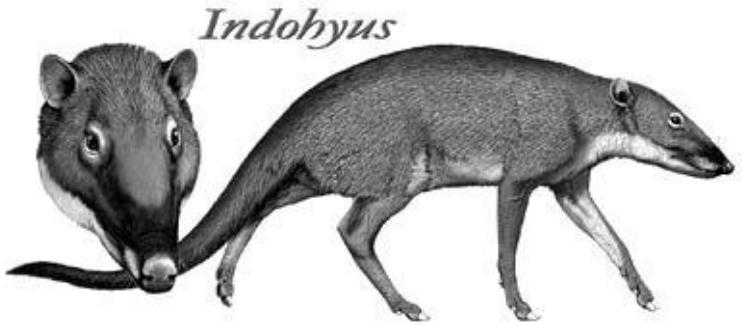

প্রাগৈতিহাসিক কালের এই ইনডোহায়াসের জীবাশ্ম নিয়ে এবার দাবি করা হলো এরাই তিমিমাছের বংশধর। তিনটি কারণ দেখানো হলো। প্রথমটি হচ্ছে এর মধ্যকর্ণ আর অন্তকর্ণের মধ্যে একটি বাড়তি দেওয়াল আছে যেমনটি জলজ স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, এটার দাঁত অনেকটা তিমিমাছের দাঁতের মতো। তৃতীয়ত, এটার চোখগুলো খুলির একটু উপরের দিকে অবস্থিত। এই তিনটি দাবি নিয়ে বিবর্তনবাদীরা ভালোই চলছিল। কিন্তু বিজ্ঞান তাদের বাধা দিল মাঝপথে। গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা গেল—

১. কানের ভেতরের দেওয়ালটি ইনডোহায়াসের জন্য স্বাভাবিক ছিল কারণ এ জলাভূমিতে ঘুরে বেড়াত এবং অন্যান্য বেশ কিছু স্থলচর প্রাণীর কানেও এমনটি দেখতে পাওয়া যায়।

২. ইনডোহায়াসের দাঁত তিমির দাঁতের মতো নয়, বরং ইনডোহায়াস ছিল তৃণভোজী প্রাণী। এক্ষেত্রে বিবর্তনবাদীদের বহুল প্রচার করা 'শিকার ধরার জন্য পানিতে নামার' তত্ত্বটিও বাতিল হয়ে যায়।

৩. চোখ দুটি খুলির একটু উপরের দিকে এমন বহু প্রাণী আছে। কাজেই এই বৈশিষ্ট্যটিকে বিশেষভাবে দেখার কিছু নেই।

তাছাড়া ইনডোয়াসের আয়তন ছিল রেকুনের সমান বা মোটাসোটা বেড়াল বা ছোটখাটো কুকুরের সমান। এই প্রাণী পানিতে নেমে তিমিমাছের মতো এত বড় হয়ে গেল কীভাবে তার ব্যাখ্যা বিবর্তনবাদীরা দিতে পারেনি। একটি দুর্বল যুক্তি তারা দেয় যে পানির প্লবতার কারণে শরীর ছেড়ে দেওয়ায় আকারে বড় হয়েছে। কিন্তু তারা বলতে পারে না সকল জলচর প্রাণীদের মধ্যে তাহলে সে প্রভাব পড়েনি কেন? তাছাড়া একটি সাধারণ আকারের তিমিমাছের পাশে একটি ইনডোহায়াসের দেহ তুলনামূলকভাবে দেখলে মনে হবে একটি যাত্রীবাসী বাসের পাশে একটি হাতব্যাগ। এই বিশাল পার্থক্য যে শুধু পানির প্লবতার জন্য হতে পারে না তা যে-কেউ আন্দাজ করতে পারে। অবশেষে বিবর্তনবাদীদের এই 'ইনডোহায়াস'ও ধোপে টেকেনি।

ভালুক, জলহস্তী বা ইনডোহায়াসের তত্ত্বকে মারাত্মক আঘাত করেছে আরেকটি প্রাণী, সেটা হলো কুমির। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অর্থাৎ কোটি কোটি বছর আগের কুমিরের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে যা হুবহু এখনকার কুমিরের মতোই। কথা হচ্ছে কোটি কোটি বছর ধরে পানিতে শিকার ধরতে ধরতে এই কুমির কেন তিমিমাছ হয়ে গেল না? প্রকৃতির পক্ষে কুমিরকে তিমিতে বিবর্তিত করাই কি সহজ ছিল না? তার বদলে একটি স্থলচর প্রাণীকে এত ঝামেলা করে 'আনফিট-ফিট-ফিটেস্টের' ভেতর দিয়ে কেন তিমিতে রূপান্তরিত করতে হবে? হিসেব করলে কুমির-ই ছিল তখন পানির প্রাণীতে পরিণত হওয়ার জন্য ফিটেস্ট। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি।